প্রমথ চৌধুরী, চলিতগদ্য আর র াজনীতি

রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

সব ক্লাসিক-এর যে-দশা হয়,প্রমথ চৌধুরীরও সেই দশা হয়েছে। প্রমথ চৌধুরী (১৮৬৮-১৯৪৬)-কে ভোলা উচিৎ নয়,ভোলার যোগ্য তিনি নন। তবু ক-জনইব া এখন তাঁর লেখা পড়েন ?

এরজন্যে অবশ্য শুধু একালের পাঠক-পাঠিকাদের দোষ দেওয়া ঠিক নয়। ১৯৪১-এ, রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর অল্প কিছুদিনপরে, প্রমথ চৌধুরীকে ত্রকটিসম্বর্ধনা দেওয়া হয়েছিল। তখনই বুদ্ধদেববসু লিখেছিলেনঃ

যদিওপ্রমথ চৌধুরীর নির্বাচিত রচনার বসুমতী-সংস্করণ বেরিয়েছে, তবুআমাদের প্রধান লেখকদের মধ্যে প্রমথ চৌধুরীর জনপ্রিয়তানিঃসন্দেহে ন্যূনতম। আর তাঁর মতঅভিজাত লেখকের পক্ষে এই বোধহয় যথাযথ সম্মান।

৩সেপ্টেম্বর ১৯৪৬-এ প্রমথ চৌধুরী মারা যান। তখনও, তাঁর সম্বন্ধে লিখতে বসে বুদ্ধদেব বসু১৯৪১-এর ঐ সংবর্ধনার উল্লেখ করেছেন। সেটি ছিল, তাঁর মতে, "নিৎসুক পাংশুতারউদাহরণ।"।

'অভিজাত'হয়ে জন্মানোর খ্যাতিই বোধ হয় প্রমথ চৌধুরীর কাল হয়েছিল। বাঙলা গদ্যর গণতন্ত্রীকরণে তাঁর ভূমিকাইপ্রধান, তবু তিনি যে হরিপুরের জমিদার বংশের সন্তান, চেহারায়,চলনে-বলনে, জীবনযাত্রায় ছা-পোষা-গেরস্ত থেকে অনেকখানিই আলাদা—এই পরিচয় তাঁর অসামান্য কৃতিত্বকে আড়াল করে রেখেছে।

তাঁর কীর্তির পরিমাণ ও বৈচিত্র্য কমনয়— কবিতা, গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, বিশেষ করে কথারলাঠালাঠি (শুদ্ধ বাঙলায় বাগ্‌যুদ্ধ, ইংরিজেতে যাকে বলে'পলেমিক') — সবেতেই তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। তবু তাঁর মৃত্যুর সাতান্ন বছর পরেতাঁর বেশির ভাগ বই-ই আর কিনতে পাওয়া যায় না। অথচতিনি বেঁচে থাকতেই তাঁর গোটা তিরিশ ছোটোবড়ো বই বেরিয়েছিল। আজ অবধি পত্রপত্রিকায় ছড়িয়ে থাকাতাঁর লেখাপত্র জড়ো করার চেষ্টা হলো না। ১৯৭০-এর দশকে বাঙলায় খ্য াত-অখ্যাত নানা লেখকের গ্রন্থাবলিবার করার ধুম পড়ে গিয়েছিল। কিন্তুপ্রমথ চৌধুরীর কোনো সম্পূর্ণ রচনাবলি আজও ছাপা হয় নি। ১৯৫২ ও ১৯৫৪-য় দুটি খণ্ডে তাঁরপ্রবন্ধসংগ্রহ বার করেছিল বিশ্বভারতী। আসলে ঐ বইটি মাত্র পঞ্চাশটি নির্বাচিত প্রবন্ধের সঙ্কলন। এছাড়া আরও কত লেখা যে পাঠকেরনাগালের ব াইরে রয়েছে তার হদিশ নেই। তাঁর অল্প কিছু চিঠি আলাদা বই হিসেবে (যেমন'বি' কে 'প্র', অর্থাৎ বিবি বা ইন্দিরা দেবীকেপ্রমথ চৌধুরী) বা স্মৃতিকথার ভেতরে (যেমন,হারীতকৃষ্ণ দেবের সবুজ পাতার ডাক-এ বা পত্রিকায় (যেমন,সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়কে লেখা) হালে বেরিয়েছে। কিন্তু এ তো ভাসমান হিমশৈলের চুড়োমাত্র। প্রথম চৌধুরীর চিঠির সংখ্যানিশ্চয়ই হাজার খানেক হবে। চিঠিইছিল তাঁর আত্মপ্রকাশের সবচেয়ে উপযুক্ত বাহন। ভয় হয়ঃ শেষে সবহারিয়ে না যায় !

প্রমথচৌধুরীর আসল কৃতিত্ব পদ্যে নয়, গদ্যে — আশাকরি, এ-কথা সকলেইমানবেন। তারও দুটি দিক আছে। এক, চলিত কোড-এ সব ধরণের গদ্য লেখ ারচলন তাঁকে দিয়েই সত্যিকারের শুহলো; দুই, রীতি বা স্টাইল-এর বিচারে তিনি ছিলেন যথার্থ শিল্পীঃ শব্দ সম্পর্কে অতিমাত্রায় সচেতন ; শুধু অর্থর বিচারে নয়, একটিওঅবান্তর কথা যেন না আসে।

গোপালহালদারের রূপনারানের কূলে থেকে কিছুটা উদ্ধৃত করা যাক। ছাত্র বয়েসে প্রথম আলাপের স্মৃতিঃ

আমরাসামান্য মানুষ, তবু মনে রয়েছে তাঁর সেদিনকার সহজ অথচ সাদর ব্যবহার;যেন সমগোষ্ঠীর মানুষের সঙ্গে কথা বলছেন। কালচার-প্রীতি যাঁদের আন্তরিক তাঁরাই এইগুণের এমন অধিকারী। একবার মাত্রএকটি কথায় মনে হচ্ছিল তিনি জানেন তিনি প্রমথ চৌধুরী—সাধারণ মানুষনন। কথাটা উঠেছিল 'চারইয়ারী কথা'র প্রসঙ্গে। আমিবোধহয় শুধু শ্রোতা না থেকে তখন বলে ফেললাম ও বই-এর অপূর্বতার কথা। চৌধুরী মশায় এতক্ষণ খুবই সহজ ছিলেন,আলমারি থেকে কী বই নিচ্ছিলেন, এবার একটু মুখ ফিরিয়ে বললেন, 'ওবইয়ের একটা কথাও কেউ বাড়াতে কমাতে পারলে আমি মেনে নেব'। মূহূর্তে মনে পড়ল তিনি কত সযত্নশিল্পী আর কত সচেতন নিজের কৃতিত্ব সম্বন্ধে।

দুই

এহলো প্রমথ চৌধুরীর কৃতিত্বের দিক। অন্যদিকে এও তো ঘটনা যে, একবার তিনি কথার খেলায় নেবে পড়লেলেখার মূল বিষয় অনেক সময়েই হারিয়ে যেত। ঢাকা রিভিউ ওসম্মিলনীর - র সম্পাদকের সঙ্গে বিতর্কে তিনি যতটা উজ্জ্বল("বঙ্গভাষা বনাম বাবু-বাঙলা ওরফে সাধুভাষা",পৌষ ১৩১৯), রাধাকমল মুখোপাধ্য ায়ের সঙ্গে বিতর্কে("বস্তুতন্ত্রতা বস্তু কি", মাঘ ১৩২১) ততটা নন। এখানে তার কারণ খুঁজব না। শুধুএইটুকুই বলব ঃপ্রমথ চৌধুরী যেখানে শুধুই প্রতিপক্ষের খণ্ডনেব্যস্ত থাকেন সেখানে তিনি অজেয়। অন্যদিকে, খণ্ডনের সঙ্গে সঙ্গে যেখানে কিছু স্থাপনের বা মণ্ডনেরব্যাপার থাকে, সেখানে তাঁর ধার কমে যায়। তাঁর লেখ ার খুঁত ধরা খুবই সহজ। কিছু মুদ্রাদোষ তো তাঁর নিত্যসঙ্গী। মাল কম মশলা বেশি— এমন লেখাও তিনি কম লেখেন নি। এই প্রসঙ্গে বিষ্ণু দে-র একটিমন্তব্য ভেবে দেখার মতঃ

সাধনাযে কঠিন তার প্রমাণ বীরবল বারবার দিয়েছেন। এমনকি পরিবেশেরপ্রভাব পরোক্ষে হয়তো তাঁর রচনাতেও স্পর্শেছে। তারই জন্যে হয়তো ব্যঙ্গের স্রোতে তাঁর লেখনী হয়ে ওঠে থেকে থেকে অতি তরল, হাস্য হয়ে ওঠে অপেক্ষাকৃত স্ফীত,যেমন হয়েছে "আমরা ও তোমরা"-য়।

একইসঙ্গে বিষ্ণু দে মনে করিয়ে দিয়েছেনঃ

অবশ্যতাঁর পরিবেশ ছিল পরাক্রান্ত; গ্রামভারী মূর্খতা,প্রাদেশিকতা, কূপমণ্ডুকতা, যুক্তিহীন বুলি, অন্ধবিশ্বাসের নেকড়েরপালের মধ্যে তাঁর কর্মক্ষেত্র। তাঁর নৈঃসঙ্গ্যে প্র

ায় একমাত্র আশ্রয় ছিলেন রবীন্দ্রনাথ, একমাত্র কিন্তু প্রবল, অলোকসামান্য প্রতিভার মহীরূহ।
অন্যএকটা কথাও মনে রাখতে হবে। রবীন্দ্রনাথের সব ভক্তই প্রমথ চৌধুরীকে পছন্দ করতেন না। তার কারণটা অবশ্য যতটা ব্যক্তিগত,ততটা সাহিত্যগত নয়। সুকুমার রায়একবার প্রমথ চৌধুরীর প্যারডি করে লিখলেন ‘‘ক্যাবলেরপত্র’’। সেটি পড়ে তাঁরমণ্ডা (মনডে) ক্লাব-এর সব সদস্য একেবারে মাত হয়ে গিয়েছিলেন।
হিরণকুমার সান্যাল জানিয়েছেন ঃ
প্রবন্ধটিসম্বন্ধে কেউ বিদ্ধ মত প্রকাশ করেন নি কেন, সে-কথা বলতে গিয়ে যেটিবলতে হবে তা খুব প্রীতিকর নয়। প্রীতিকর নয়, তবে জানবার মত। আমাদের দেশে গোষ্ঠিগত যে-দ্বন্দ্ব বরাবর রয়েছে তারপ্রকাশ এখানেও। রবীন্দ্রগোষ্ঠিরমধ্যে দুটি দল ছিল। একটি সবুজ পত্র বাপ্রমথ চৌধুরীর গোষ্ঠী। মান্ডে ক্লাব যে-সময় শু হয় সে সময়েই সবুজ পত্র-এরও সূচনা। সবুজ-গোষ্ঠীর সঙ্গে এই মান্ডে ক্লাবেরযাঁরা রবীন্দ্রনিষ্ঠ ছিলেন, অনেকেই ছিলেন, যেমন তাতাদা (সুকুমাররায়)প্রশান্ত মহলানবিশ অজিত চক্রবর্তী, কালিদাস নাগ,অমল হোমইত্যাদি—এঁদের কোথায় যেন একটা বিরোধ ছিল। এখানে বলা যায়, প্রমথ চৌধুরী এবং তাঁরস্ত্রী ইন্দিরা দেবীর মত সত্যিকারের সজ্জন খুব কম দেখেছি। প্রমথ চৌধুরীর লেখায় কারো সম্বন্ধেযদি খোঁচা থাকত সেটা তাঁর অন্তরের কথা নয়; কারো সম্বন্ধেতিনি কখনোই শত্রুতার ভাব পোষণ করতেন না। তাই বিরোধটা কিসের বলতে পারব না। মনে হয় একান্ত ব্যক্তিগত; এঁরা যেপছন্দ করতেন না প্রমথ চৌধুরীকে তার কারণ বোধহয় বীরবলেরভঙ্গিদোষ — একটু অতিরিক্ত চোখা-চোখা কথা, খুব বলবার কিছু নাথাকলেও।

তিন

বাঙলাসাহিত্যে প্রমথ চৌধুরীর দান ঠিক কী ? তা বুঝতে হলে সাহিত্যের বাইরের একটি কথা খেয়াল করতেহবে। বাঙলা গদ্যর গণতন্ত্রীকরণেরাজনীতির খুব বড় ভূমিকা ছিল। স্বদেশী যুগে সন্ধ্যা পত্রিকায় ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের(১৮৬১-১৯০৭) হাতে প্রাঞ্জল বাঙলা গদ্যর গোড়াপত্তন হয়। মতে মিলত না হয়তো, তবু ব্রহ্মবান্ধবেররচনারীতিকে প্রমথ চৌধুরী শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন। একটা সময়ে, প্রমথ চৌধুরী নিজেওনামলেন সাংবাদিকতায়, রাজনীতিই তার একমাত্র বিষয়। আর তাঁর প্রভাবেই বাঙলারবিপ্লবীরা সাধু গদ্য ছেড়ে এলেন চলিত গদ্যে।
প্রমথচৌধুরীর লেখাপত্রর এই দিকটি প্রায় চাপা পড়ে গেছে। হারীতকৃষ্ণ দেব জানিয়েছেন ঃ‘প্রমথ চৌধুরীর তাঁর বড় ভাই আশুতোষ চৌধুরীর মতনই‘‘মডারেট’’ ছিলেন। এটুকু বললেই কিন্তু সববলা হয় না।য ‘‘রায়তের কথা’’ (১৩২৬) কোনোনরমপন্থীর কলম থেকে বেরতে পারত না। ঐ বক্তৃতা পড়ে তখনকার রাজনীতিকরা আদৌ খুশি হননি, বরং নরমপন্থী ওচরমপন্থী—দুদলই অস্বস্তিতে পড়েছিলেন। তাঁদের দেশপ্রেম যে রায়ত(প্রজা) অবধি পৌঁছয় না — এই সরল সত্যটি প্রকটহয়ে গেল।
এতবছর বাদে ‘‘রায়তের কথা’’ পড়তে গেলে তার পটভূমিজানা দরকার। অতুলচন্দ্র গুপ্তর জমিরমালিক (১৯৪৪)-এ সেই পটভূমি পাওয়া যায় ঃ
চাষীও চাষের জমি নিয়ে বাংলা দেশে বর্তমান আন্দোলনের উৎপত্তি হয়েছে মন্টেগুচেমস্ফোর্ড রিফর্মে, অর্থাৎ ব্রিটিশ পার্লেমেন্টের ১৯১৯ সালের ভারত-শাসনআইনে। গত এক নম্বর মহাযুদ্ধেরঅবসানের পূর্বেই বেশ বোঝা গেল, মর্লি-মিন্টো নামাঙ্কিত যে শাসন-পদ্ধতিভারতবর্ষে চলছিল ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষরা তার বদল ঘটাবেন। ফলে কোনো কোনো বিষয়ে আইন করারসামান্য কিছু ক্ষমতা ভারতবাসীর হাতে আসবে। কিন্তু এই সামান্য উদ্দেশ্যের উপায়স্বরূপে আইনসভাগুলিরসভ্যসংখ্যা বাড়বে একটু অসামান্য রকমে। এবং, অনুপাতে তার চেয়েও অনেক বেশি বাড়ানো হবেভোটদাতাদের সংখ্যা, যাদের ভোট কুড়িয়ে শাসনপরিষদে আসন পাওয়া যাবে। এদেশের বেশির ভাগ লোক চাষী। যে গুণে ভোটেরঅধিকার আসবে তাতেভোটদাতাদের তালিকায় চাষীর সংখ্যা হবে বেশ মোটা রকমের। তারা যদি দল বাঁধতে পারে তবে তাদের ভোট উপেক্ষা করা বেশির ভাগ সভ্যপদ প্রার্থীর পক্ষেইসম্ভব হবে না। দেশময় সাড়া প'ড়েগেল।
এইহলো ‘‘রায়তের কথা’’-র পটভূমি। প্রমথ চৌধুরী তাতে লিখেছিলেনঃ
পলিটিশিয়ানরাপ্রজার হয়ে কোনোরূপ দাবি করতে প্রস্তুত নন— আমার এ বিশ্বাসযদি অমূলক হয়, তা হলে তার জন্য প্রধানতঃ পলিটিশিয়ানরাই দায়ী। মডারেট এক্সট্রিমিস্ট কোনো দল থেকেইঅদ্যাবধি কোনো প্রোগ্রাম বার হয় নি, এবং তা বার করবার তাঁদের যেকোনোরূপ অভিপ্রায় আছে, তার কোনো আভাসও তাঁদের কাছ থেকেপাওয়া যায় না।
এরপরে আসে নরমপন্থীদের নিয়ে বিদ্রূপ ঃ
শুনতেপাই যে, মডারেট দল জমিদারদের সঙ্গে সন্ধি করবার চেষ্টায় ফিরছেন। তাঁদের নাকি বিশ্বাস যে,নায়েব-গোমস্তার সাহায্যে তাঁরা প্রজার ভোট আদায় করতেপারবেন, উপরন্তু জেলার হাকিম ও পুলিশের কো-অপারেশনের উপরও তাঁরাভরসা রাখেন। এ কথা যদি সত্য হয় তাহলে তাঁদের অন্য প্রোগ্রামের কোনো প্রয়োজন নেই। ‘জোরযার ভোট তার’ — এই হচ্ছে তাঁদের প্রোগ্রাম।
চরমপন্থীদেরসম্পর্কে প্রমথ চৌধুরীর বিদ্রূপ আরও চোখা ঃ
এঁদেরসঙ্গে কথোপকথনের ফলে আমার মনে এই সন্দেহ জন্মেছে যে, কি উপায়েকৃষকের অবস্থার উন্নতি করা যায় সে বিষয়ে হয় তাঁদের কোন মতনেই আর না হয় তো সে মত এখনও তাঁরা প্রকাশ করতে চান না।
প্রমথচৌধুরী স্পষ্ট বুঝতেন ঃ ‘‘যে প্রজার অধিকারের কথাতোলে,কারও মতে সে বলশেভিক, কারও মতে সে চিরস্থায়ীবন্দোবস্তের শত্রু, আবার কারও মতে বা সে এক সম্প্রদায়ের সঙ্গে আর-একসম্প্রদায়ের মারামারি-কাটাকাটির পক্ষপাতী।’’ প্রমথচৌধুরী অবশ্য বলশেভিক ছিলেন না। তবেতাঁর পরামর্শ ছিল ঃ‘‘যাঁরা বলশেভিজমের ভয়ে কাতর তাঁদেরঅনুরোধ করি যে, তাঁরা বাংলার রায়তকে বাংলার [illegible] করবার জন্য তৎপর হোন। যে রকম দিনকাল পড়েচে, তাতে করে মানুষকে আর দাস ও দরিদ্রকরে রাখা চলবে না। প্রজাকে এসবঅধিকার আমরা যদি আজদিতে প্রস্তুত না হই তো কাল তারা তা নিতেপ্রস্তুত হবে।’’
এ হলোউদারপন্থী মনের লক্ষণ। প্রমথ চৌধুরী নিজে জমিদার ছিলেন, তাঁর আত্মীয়স্বজনজ্ঞাতিকুটুম্ব সবাই জমিদার। তিনিতাই লেখেন ঃ ‘‘জমিদারের উপর বঙ্কিমচন্দ্র যে আক্রমণ করেছিলেনসে আক্রমণ করতে আমি অপারগ। কেননাআমি জানি যে সে আক্রমণ অন্যায়’’। তবু ‘‘রায়তের কথা’’-র শেষে তিনিবঙ্কিমের ‘‘সাম্য’’ (১৮৭৯) থেকেই উদ্ধৃতিদেন, আর সিদ্ধান্ত করেন ঃ ‘‘বঙ্কিমচন্দ্র কিরূপ বিধির কথাবলেছিলেন জান? — ইংরেজিতে যাকে বলে কম্যুনাল প্রপার্টি।’’
প্রমথচৌধুরী নিজেই একটি সভায় টানা এক ঘন্টা পঁয়তাল্লিশ মিনিট ধরে‘‘রায়তের কথা’’ পড়ে শুনিয়েছিলেন।পরে এটি সবুজ পত্র-য় বেরয় (ফাল্গুন -চৈত্র ১৩২৬)। বিলি করার জন্যে বক্তৃতাটি পুস্তিকা আকারে এক হাজার কপিছাপা হয়। সবুজ পত্র-এ রবীন্দ্রনাথ এবিষয়ে তাঁর মত জানান (আষাঢ় ১৩৩৩)। পরে (বৈশাখ ১৩৫১) বিশ্বভারতীর বিশ্ববিদ্যা-সংগ্রহগ্রন্থমালায় প্রমথ চৌধুরী ও রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধদুটির সংশোধিতসংস্করণ বেরয়।
‘‘রায়তের কথা’’ লিখে প্রমথচৌধুরী বেশ তৃপ্তি পেয়েছিলেন। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়কে একটি চিঠিতে তিনি জানানঃ‘‘রায়তের কথা’’ নিয়ে বাঙলার চা - পেয়ালায় অবশ্যএকটা তুফান উঠেছে। বাঙলা দৈনিকপত্রগুলোর দিন কয়েকের খোরাক ঐ প্রবন্ধটি জুগিয়েছে। দিনের পর দিন,‘‘বাঙালী’’ ‘‘নায়ক’’‘‘হিন্দুস্থান’’

প্রভৃতি কাগজগুলো ধারাবাহিকভাবে ঐ লেখাদিয়ে তাদের ‘‘স্তম্ভপূরণ’’ করেছে। ‘‘রায়তের কথা’’লেখার আগে অবধি চরমপন্থীরা প্রজাস্বত্বর ব্যাপারেমুখ খোলেননি। পরে দেখা গেল এ ব্যাপারেনরমপন্থীদের সঙ্গে তাঁদের কোনো তফাত নেই। প্রমথ চৌধুরী মজা করে লিখেছিলেন ঃ

আজপর্য্যন্ত জমিদার বর্গ আমার কথার প্রতিবাদী হননি। সম্ভবত তাঁরা মনে করেন এ ক্ষেত্রে নীরবথাকাই শ্রেয়— কেননা কথাটা নিয়ে বেশি ঘাঁটাঘাঁটি করার ভিতরতাঁদের বিপদ আছে। যতদূর জানিদেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় আমার সঙ্গে একমত শুধু পলিটিসিয়ানরা আমারউপর ব্যাজার হয়েছেন। ত্ত্বব্ধনস্থ্রপ্তনব্দব্ধ ওরফে ন্দপ্রব্ধজন্দপ্তনব্দব্ধ -রাত চটে একেবারে আগুন। তাঁদেরপক্ষ থেকে শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী মহাশয় এক প্রোগ্রাম বারকরেছেন তার মোদ্দা কথা এই যে রায়তদের কোনও অধিকার দেওয়া হবে নাঅন্তত এখন ত নয়ই। এখন তাদের liberty- equality —রমন্ত্র জপ করতে শেখানো যাক্ পরে দূর ভবিষ্যতে তাদের কোনওরূপঅধিকার দেওয়া না দেওয়ার কথা বিচার করা যাবে। শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাস প্রভৃতি‘‘চুস্মেরে’’ বসে আছেন। দেশের মনের হাওয়া কোনদিকে বয় তাই দেখে তাঁরা তাদেরপলিটিকাল পাল খাটাবেন। আমাদেরপলিটিসিয়ানদের এইসব ব্যবসাদারি দেখে একবার পলিটিক্সের আখড়ায় নামতেইচ্ছে যায়।

‘‘রায়তেরকথা’’-য় প্রমথ চৌধুরীর বক্তব্য নোয়াখালিতেও আমাদের মনেরকথার যুক্তি যুগিয়েছিল—জানিয়েছেন গোপাল হালদার। সেই সঙ্গেএই কথাও মনে রাখার ঃ ‘‘বঙ্গ দর্শনে’’—এর পরে‘সবুজ পত্রে’’র ‘‘রায়তের কথা’’ইবাঙালিসমাজের মূল সমস্যাটিকে আবার জীইয়ে তোলে—‘‘লাঙলে’’রজন্ম তার পরে (১৯২৫)’ প্রথম আলাপে গোপালহালদারকে প্রমথ চৌধুরী বলেছিলেন ঃ কংগ্রেসে দু-একটি মোড়ল গোছেরহাফনেতা প্রজাপক্ষের সে বক্তব্যের প্রতিবাদে এখানে-ওখানেসভা-সমিতি ও বক্তৃতা করছে। তাঁদেরসম্পর্কে প্রমথ চৌধুরীর তির্যক মন্তব্য ঃ‘‘কিছু জোৎটোৎরাখে বোধ হয়।’’ গোপালহালদার পরে লিখেছেন ঃ

তাঁরএ ধারণাও সম্ভবত মিথ্যা নয়, আমারা জানতাম। অবজ্ঞা আর সমাজ-বিজ্ঞানীর স্থির দৃষ্টি চৌধুরী মশায়েরসে কয়টি শব্দের মধ্যে দেখেছিলাম। স্বরাজ্য পার্টির জমিদারবাবুরাও প্রজাস্বত্বেরপ্রশ্নে জোতদারদের সঙ্গে শ্রেণীস্বার্থের টানে একত্রিত।

এইসময়ের (১৯২০) অন্যান্য চিঠিপত্রেও দেখা যায় ঃ প্রমথ চৌধুরীআরও সরাসরি রাজনীতিতে নামার কথা ভাবছেন। তার আগে থেকেই অবশ্য সবুজ পত্র-য় রাজনীতি নিয়ে তাঁরধারালো মন্তব্য বেরচ্ছে। চৌরিচৌরা-র ঘটনার পর (ফেব্রুয়ারি ১৯২১) গান্ধীঅসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার করে নিলেন। প্রমথ চৌধুরী আবার হাত দিলেন রাজনৈতিক রচনায়। একটি চিঠিতে তিনি জানাচ্ছেন ঃ

শুধুচরকা আর খদ্দর নিয়ে বাঙলা থাকতে পারে না। এই অবসরে আমি আবার লিখতে আরম্ভকরেছি। তিনখানি নতুন সাপ্তাহিক পত্রে‘‘শঙ্খ’’ ‘‘বিজলী’’ ও ‘‘আত্মশক্তি’’-তেনিয়মিত লিখছি। এটা একটা নতুন খবরকি না? সব লেখাই অবশ্য স্বনামে লিখি। প্রমথ চৌধুরী ও বীরবল, দুজনেইহপ্তায় তিন দিন — সংবাদপত্রের স্তম্ভেআবির্ভূত হল।

এধরণের কাগজে লিখে প্রমথ চৌধুরী খুবই খুশি, কারণ ‘এরা সব‘‘বীরবলী’’ ভাষা অঙ্গীকার করেছে এবং সেই সঙ্গে ‘‘বীরবলী’’ ঢঙও।সুতরাং এরা সব ফূর্ত্তি করে লেখে।’ প্রমথ চৌধুরীর এই লেখাগুলিএখনও অবধি এক জায়গায় করা হয় নি। অথচ এগুলি অন্য এক প্রমথ চৌধুরীর পরিচয় দেয়। অন্নদাশঙ্কর রায় মনে করেন ঃ বিজলী-রসেই ফাইলটি যদি কেউ উদ্ধার করতে পারেন সেটা ‘‘সবুজপত্র’’-র পরিপূরক হবে। ঠিক কথা।

প্রমথচৌধুরীর রাজনৈতিক মতামতের অন্য একটা গুত্বও আছে। ভালো হোক মন্দ হোক, বাঙালি শিক্ষিতসমাজের একটি বড় অংশ যে গান্ধী-বিমুখ ও বিরোধী হয়ে উঠেছিল তার পেছনেপ্রমথ চৌধুরীর ভূমিকা নেহাত কম নয়। কলকাতা ছাড়িয়ে অবিভক্ত বাঙলার শেষ প্রান্তেও তাঁরপ্রভাব পড়েছিল। কংগ্রেসের কর্মীঅথচ কংগ্রেসকে বরাবর খোঁচাদেন —এই ধারাটা বাঙলারই নিজস্ব। গোপাল হালদার স্বীকার করেছেনঃ‘‘ওটা প্রমথ চৌধুরীর ঢঙ।’’

অবস্থাপন্ন লোকদের ‘‘রাজনীতি করা’’ বলতে তখন যাবোঝাত—কাউন্সিল-এর সদস্য হওয়া, কংগেস ও/বা স্বরাজ্য দলে ঢুকেঘোঁট পাকানো, ইত্যাদি—প্রমথ চৌধুরী অবশ্য তা করেন নি। তবে কলকাতার বিশেষ কংগ্রেস অধিবেশনে (১৯২০)তিনি গিয়েছিলেন, যদিও শেষ পর্যন্ত আর রাজনীতির সঙ্গে কোনো যোগইরাখেন নি। সব মিলিয়ে তাই মনে হয় ঃবাঙলার রাজনৈতিক ইতিহাসের স্বার্থেই প্রমথ চৌধুরীর রাজনৈতিক লেখাগুলিএক জায়গায় করা দরকার।

চার

শোনাযায় বিলেত থেকে ফিরে আশুতোষ চৌধুরী (১৮৫৯-১৯২৪) বাঙলায়ভিজিটিং কার্ড ছাপিয়েছিলেন। চৌধুরী পরিবারে নববর্ষ পালন করা হতবাঙলা পাঁজি অনুযায়ী। সানি পার্ক-এরবাড়িতে ঐ দিন বাঙলা গান, নাটক-অভিনয় ইত্যাদি হত। হারীতকৃষ্ণ বলেছেনঃ ‘তাঁর(আশুতোষ চৌধুরী) দেশ মানে বঙ্গদেশ, জাতীয় ভাষার অর্থ বঙ্গভাষা। প্রমথ চৌধুরীর‘‘বাঙালি পেট্রিয়টিজম’’ প্রবন্ধ পড়লে দেখা যায় ওইএকই মনোভাব ....।’

আশুতোষচৌধুরী অবশ্য পরে আর বাঙলা সাহিত্যের সঙ্গে কোনো যোগ রাখেননি।;; ত্রমেই তিনি, রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, ল’য়ের (স্তুভ্র - এর) ভেতরে লীন হয়ে গেলেন। রাজনীতির সঙ্গে তাঁর যোগ থাকল আইনপরিষদের সদস্য হিসেবে। কিন্তু মনে হয়,সর্বভারতীয় রাজনীতির চেয়ে তাঁর আসল ভাবনা ছিল বাঙলার ভবিষ্যৎ নিয়ে। প্রমথ চৌধুরীর ক্ষেত্রেকথাটা আরও বেশি সত্যি। রাজনীতিরজগতে বাঙালির প্রতিষ্ঠা যত কমে আসে, প্রমথ চৌধুরীর বাঙালিপেট্রিয়টিজ্‌ম্ যেন তত বেশি শেকড় গাড়ে। অমৃতসর কংগ্রেস (১৯১৯)-এর পরে এক বন্ধুকে তিনিলেখেন ঃ

তুমিআমার বিদ্ধে এই অভিযোগ আন যে আমার অন্তরে যা আছে সে হচ্ছে বাঙালিপেট্রিয়টিজ্‌ম্। এ অভিযোগ আমি কবুলজবাব দিতে বাধ্য। বাঙালি-পেট্রিয়টিজ্‌ম্-কে মনে আশ্রয় ও প্রশ্রয় দেওয়াটাবাঙালির পক্ষে যদি দোষের হয় তা হলে সে-দোষে আমি চিরদিনই দোষীআছি।

কংগ্রেসঅধিবেশনে যাঁরা ইংরিজিতে গলাবাজি করতেন, তাঁদের সম্পর্কে প্রমথচৌধুরীর অগাধ অশ্রদ্ধা। তার কারণ ঃতাঁরা শুধু মুখস্থ ভাবই প্রকাশ করেন ঃ

দেশকেভালোবাসার অর্থ দেশবাসীকে ভালোবাসা— কেননা মানুষে শুধু মানুষকেইভালবাসে ... আর বাঙালি বাঙালিমাত্রেরই স্বজন, তার কারণ ভাষার যোগ হচ্ছে মানস-কায়ে রক্তের যোগ।

বাঙালিরঐক্যসূত্র যে ধর্ম বা আর কিছু নয়, শুধুই ভাষা—এই বোধটি বঙ্কিমচন্দ্র ওরবীন্দ্রনাথের মতো প্রমথ চৌধুরীরও ছিল।

ঐএকই প্রবন্ধেপ্রমথ চৌধুরী নির্দ্বিধায় স্বীকার করেছেন—

.....বাংলাদেশে বাঙালির ঘরে জন্মালেও আমি খাঁটি বাঙালি নই। একছত্র একদণ্ড ইংরেজ শাসনের অধীনে বাস করে,আর পাঁচ থেকে পঁচিশ বৎসর বয়েস পর্যন্ত ইংরেজি শাসিত স্কুল-কলেজেইংরেজি শিক্ষা লাভ করে আমি হয়ে উঠেছি একজন নিয়ো ইণ্ডিয়ান,ওরফে নন-ইণ্ডিয়ান, অর্থাৎ কংগ্রেসওয়ালারা যে জাত আমিও সেই জাত।

এইঅকণ আত্মসমালোচনার পরে তিনি লেখেন ঃ

ত্রন্দ্বপ্তন্দ্র -স্তুন্দ্বব্ধন্দ্বজপ্তন্ত্রব্ধনস্ক স্পন্দ্র ব্দস্থ্রপ্তপ্ত্রব্ধনস্কব্দ -এর মতানুসারেবাঙালি-পেট্রিয়টিজ্‌মের বিশেষ সার্থকতা আছে। প্রথমতঃ আমরা একটি বিশেষ জাতি,তার পর আমরা একটি ক্ষুদ্র জাতি, সুতরাং আমাদের সেলফ্-ডিটারমিনেশন-বিরোধী হচ্ছে ইণ্ডিয়ান ইম্পিরিয়ালিজ্‌ম্। আর গত যুদ্ধে(প্রথম বিশ্বযুদ্ধে) প্রমাণ হয়ে গেছে যে, ইম্পিরিয়ালিজ্‌ম্সর্বনেশে জিনিস, তা সে স্বদেশিই হোক আর বিদেশিই হোক।

স্বরাজআমরা পেয়েছি ১৯৪৭-এ। প্রমথচৌধুরী তা দেখে যেতে পারেন নি। কিন্তু প্রীতির প্রভাবে ভারতীয় ঐক্য এখনও দূরঅস্ত্। বরং সর্বভারতীয়তারচাপে ব

াঙলা ভাষা ও বাঙালি সত্তা অনেকটাই খাটো হয়ে গেছে—স্বরাজ এরসঙ্গে সঙ্গে বাঙলা-ভাগ থেকেই তার শু। আবার প্রমথ চৌধুরীর কথা দিয়েই এই প্রসঙ্গে দাঁ ড়িটানি ঃ

আমার শেষ কথা এই যে, যে দেশকে আমি অন্তরের সহিত ভালোবাসি, সে বর্তমানবাংলা নয়, অতীত বাংলাও নয়—ভবিষ্যৎ বাঙলা, অর্থাৎ যে বাংলা আমাদের হ াতেও মনে গড়ে উঠছে। সুতরাং আমারবাঙালি-পেট্রিয়টিজ্‌ম্‌ বর্তমান ভারতবর্ষীয়-পেট্রিয়টিজ্‌মের বিরোধী নয়। আর-এক কথা, যে-ন্যাশনালিজ্‌ম্‌বিদ্বেষবুদ্ধির ওপর প্রতিষ্ঠিত, সে ন্যাশনালিজ্‌মের ফলে শুধু পরেরনয় নিজেরও যে সর্বনাশ হয়, গত ইউরোপীয় যুদ্ধ (প্রথমমহাযুদ্ধ) এই সত্য যার চোখ আছে তারই চোখের সমুখে ধরে দিয়েছে।

পাঁচ

প্রমথচৌধুরীর রাজনীতি-ভাবনা নিয়ে অনেক কথা হলো। আবার ভাষার কথায় ফেরা যাক। প্রমথ চৌধুরীই প্রথম বাঙলা গদ্যকে সংস্কৃত ও /বাইংরিজির প্রভ াবমুক্ত করে, বিচার বিবেচনা ও যুক্তির পথ ধরে এগিয়েনিয়ে গেলেন। ইতিহাস,সাহিত্য-সমালোচনা, রাজনীতি—সর্বত্র তার বিস্তার। আর সব ধরণের লেখার ক্ষেত্রেই দেখা যায়ঃ তাঁর গদ্য মানে গদ্যই —উপমার বাড়াবাড়ি নেই, ত্রিয়া যখন-তখন জায়গাবদল করে না, ব্রেথ গ্রুপ আর সেন্‌স্‌ গ্রুপ-এর ঐক্য অটুট থাকে। আর,সবচেয়ে বড় কথা, তাঁর বক্তব্য মানি বা না-মানি, বুঝতে কোনো অসুবিধে হয়না। এই সবকটি গুণ একসঙ্গে খুব কমলেখকের রচনাতেই দেখা যায়। অ াযৌবনরবীন্দ্রনাথের ছত্রচ্ছায়ায় থাকলেও তাঁর ওপর রবীন্দ্রনাথের গদ্যর কোনোপ্রভাব পড়ে নি (বরং রবীন্দ্রনাথকে তিনি নামিয়েছেন চলিত কোড-এলিখতে)

তবেতাঁর একটি আশা এখনও মিটল না, কবে যে মিটবে তা-ও বলা যাচ্ছে না। প্রমথ চৌধুরী একবার লিখেছিলেন ঃ

বাংলাগদ্যের বয়স সবেএকশ বছর হলেও তা এক যুগ পিছনে ফেলে এখন দ্বিতীয় যুগে চলছে। প্রথম যুগে সংস্কৃত গদ্যেরঅনুকরণে এবং সংস্কৃত শব্দের উপকরণে বাংলা গদ্য লেখা হত। যে যুগ চলছে, তাতে বাংলা গদ্য গঠিত হয়েছেইংরেজি বাক্যের অনুকরণে এবং সংস্কৃত শব্দের উপকরণে। আমার বিশ্বাস, এখন আমরা ত ার তৃতীয়যুগের, অর্থাৎ সম্পূর্ণ স্বাধীনতার যুগের, মুখে এসে পৌঁছেছি।

সংস্কৃতশব্দে তাঁর আপত্তি ছিল না, তিনি শুধু চাইতেন ঃ শব্দটি যেন বাঙলা ভাষারস্বভাবের সঙ্গে খাপ খায়। তিনিলিখেছিলেন ঃ

একথা আমি অবশ্য মানি যে, আমাদের ভাষায় কতক পরিমাণে নতুন কথা আনবারদরকার আছে। যার জীবনআছে, তারইপ্রতিদিন খোরাক জোগাতে হবে। অ ার আমাদের ভাষার দেহপুষ্টি করতে হলে প্রধানতঅমরকোষ থেকেই নতুন কথা টেনে আনতে হবে। কিন্তু যিনি নূতন সংস্কৃত কথা ব্যবহার করবেন, তাঁর এই মনের খা উচিত যে, তাঁর আবার নূতন করে প্রতি কথাটিরপ্রাণপ্রতিষ্ঠা করতে হবে; তা যদি না পারেন তাহলেবঙ্গসরস্বতীর কানে শুধু পরের সোনা পরানো হবে। বিচার না করে একরাশ সংস্কৃত শব্দ জড়ো করলেই ভাষারও শ্রীবৃদ্ধিহবে না, সাহিত্যেরও গৌরব বাড়বে না, মনোভাবও পরিষ্কার করে ব্যক্ত করা হবেনা। ভাষার এখন শা নিয়ে ধার বারকরা আবশ্যক, ভার বাড়ান নয়। যে কথাটি নিতান্ত না হলে নয় সেটিযেখান থেকে পার নিয়ে এস, যদি নিজের ভাষার ভিতর তাকে খাপ খাওয়াতেপ ার। কিন্তু তার বেশি ভিক্ষেধার কিংবা চুরি করে এন না। ভগবানপবননন্দন বিশল্যকরণী আনতে গিয়ে আস্ত গন্ধমাদন যে সমূলে উৎপাটিত করেএনেছিলেন তাতে তাঁর অসাধারণ ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন, কিন্তু বুদ্ধিরপরিচয় দেন নি।

সুধীন্দ্রনাথদত্ত প্রমুখ কিছু লেখক এই সহজকথাটি বোঝেন নি। অভিধান ঘেঁটেঅচলিত সংস্কৃত শব্দ আমদানি করে তাঁরা শুধু ভারই বাড়িয়েছেন, ধার বাড়াতেপ ারেন নি। তাঁদের ভাষা একসঙ্কীর্ণ শিরোমণি (এলিট) গোষ্ঠীর ভাষাই রয়ে গেছে।

তেমনিইংরিজি বাক্য ও বাক্যাংশেও প্রমথ চৌধুরীর আপত্তি ছিল না। শুধু দাবি ছিল ঃ বাঙলাটা যেন বাঙলার মতোহয়। দুঃখের কথা, ভাষাকে কাব্যময়করার জন্যে, বা নিজেকে সবার থেকে আলাদা প্রমাণ করার চেষ্টায়,বিস্তর লোক বাঙলা ভাষার স্বভাবের ওপর অত্যাচার করেন। আর খবরকাগুজে লোকজন তো দুনিয়ারবার। লঘুতা আর ইতরতার মধ্যেকোনো তফাত থাকছে না ঃ গুতরবিষয় নিয়ে অযোগ্য লোক ফক্কুড়ি করছে, খেলো জিনিসকে ভীষণ গুত্ব দেওয়াহচ্ছে। এইসময়ে প্রমথ চৌধুরীর লেখা পড়লে হয়তো কারও কারও সংবিৎ ফিরতেপারে। 'ভাষাভাষী'-র মতো উৎকট শব্দ লেখা বন্ধ হতে পারে।

ছয়

'ভাষাভাষী'-র কথাই যখন এল তখনতার গল্পটা খুলে বলাযাক। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বাল্যকথা'-র ভাষা নিয়েঢাকার অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ ভদ্র কিছু আপত্তি তুলেছিলেন। ঢাকা রিভিউ ও সম্মিলনী নামে একআধা-ইংরিজি আধা-বাঙলা মাসিকপত্রে অধ্যাপক ভদ্র লিখলেনঃ

মুদ্রিতসাহিত্যে আমরা 'করতুম' 'শোনাচ্ছিলুম'ডাকতুম' মেশবার' ('খেনু' 'গেনু'-ইবা বাদ যায় কেন?) প্রভৃতি প্রাদেশিক শব্দ ব্যবহারের পক্ষপাতী নহি। অন্য ভ াষাভাষী বাঙালির অপরিজ্ঞাত ভাষাপ্রয়োগে সাহিত্যিক্‌ (তথৈব) সংকীর্ণতা প্রকাশ পায়বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

প্রমথচৌধুরী আর লোভ সামলাতে পারলেন না। জবাবে তিনি লিখলেন ঃ

শুনতেপাই কোনো-একটি ভদ্রলোক তিন অক্ষরের একটি পদ বানান করতেচারটি ভুল করেছিলেন। 'ঔষধএই পদটি তাঁর হাতে 'অউসদ' এই রূপ ধারণ করেছিল। সম্পাদক মহাশয়ও একটি বাক্য রচনায়অন্তত পাঁচ-ছটি ভুল করেছেন....।

এরপরদফায় দফায় সত্যেন্দ্রনাথ ভদ্র-র ভুলগুলো দেখিয়ে প্রমথ চৌধুরী এলেন'ভাষাভাষী' প্রসঙ্গে। একটি বাক্যেই শব্দটিকে তিনি শুইয়ে দিলেন, বক্‌সিং-এ যাকে বলে'নক আউট' ঃ

'ভাষাভাষীএই সমাসটি এতই অপূর্ব যে, ও কথা শুনে হাসাহাসি করা ছাড়া আর কিছু করাচলে না।

দুঃখেরবিষয়, প্রমথ চৌধুরী ছাড়া আর বিশেষ কেউই ঐ 'অপূর্ব'সমাসটি নিয়ে হাসাহাসি করেন না। বিরাট বিরাট সাহিত্যিক-সাংবাদিক-শিক্ষক-বুদ্ধিজীবী'বাঙল াভাষী' লিখে সুখে পান না, লেখেন 'বাঙলাভাষাভাষী'। এর জন্যেই কিকথায় বলে ঃ উলুবনে মুক্তো ছড়াতে নেই?

টীকা

১. "প্রমথচৌধুরী ও বাংলা গদ্য", কালের পুতুল, পৃ. ১৬ ।

सृष्टिसन्धान

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com